দৈনিক জনকণ্ঠ

17 APR 2007

জাবিতে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ, পরিবহন ভর্তি নিয়োগ– সব খাতেই দুর্নীতি

মোশতাক আহমেদ/কুন্তল রায় ॥ ভয়াবহ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে ছাত্র ভর্তি, পরিবহন ও বিদ্যুত খাতসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদায়ী জোট আমল থেকে শুরু করে এখনও এই অনিয়ম-দুর্নীতি চলছে। জোট আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত খোদ বিশ্ববিদ্যালয়টির শীর্ষ কর্তার বিরুদ্ধেই উঠেছে নানামুখী অভিযোগ।

জোট আমলে উপাচার্য অধ্যাপক জসীমউদ্দিন আহমেদের নানামুখী বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ আন্দোলনের মুখে ২০০৪ সালের ২০ মার্চ জসীমউদ্দিনকে সরিয়ে উপাচার্য করা হয় অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানকে। শুরুতে খন্দকার মুস্তাহিদের ওপর ক্যাম্পাসের

দল ভারি করতে যোগ্য প্রার্থী বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীর চাকরি

ছাত্র-শিক্ষকদের অনেক প্রত্যাশা থাকলেও অচিরেই সেই প্রত্যাশার গুড়েবালি পড়ে। উপাচার্য হিসেবে তাঁর দায়িত্বগ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতির যে মহোৎসব শুরু হয়েছিল, তার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অবশ্য সকল অভিযোগ অস্বীকার করে উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান জনকণ্ঠকে বলেছেন, প্রয়োজনের জায়গা থেকেই তিনি এসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

(১১· পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

জাবিতে ভয়াবহ

(১২-এর পাতার পর)

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ পরিপন্থী কোন কাজ কখনও করা হয়নি। এটা ঠিক আমার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যত্রতত্র নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিন বছর আগে একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সভায় এসব শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। নতুন শিক্ষাবর্ষে বিক্রি করা ভর্তি ফরমের টাকা ভর্তি কার্যক্রমেই শেষ হয়ে যায়। এই টাকা শিক্ষকদের পকেটে যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের '৭৩ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া নতুন বিভাগ খোলা যায় না। গাড়ি ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন, প্রয়োজন হলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অতিরিক্ত গাড়ি ব্যবহার করি। ব্যক্তিগত কোন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করি না।

নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠার ৩৪ বছর পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪টি বিভাগে শিক্ষক সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৬৫, মাত্র ৩ বছরে ২৬ টি বিভাগে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬০। অর্থাৎ ৩ বছরে নতুন নিয়োগ পেয়েছেন ৯৫ জন শিক্ষক, যার মধ্যে ৪০ জনকে বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিগত জোট সরকারের ক্ষমতা ছাড়ার আগের ৩ মাসে ৭৮টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে ৩০জনই সম্পূর্ণ নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির মধ্যে সিন্ডিকেটসভা ডেকে এসব নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। এর বাইরেও আরও ২৮ শিক্ষক প্রাথমিকভাবে সিলেকশন করা হয়েছে। বাকি শুধু সিন্ডিকেট। সেটিও যেকোন সময় হতে পারে। নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে দল ভারী করার জন্য অনেক অযোগ্য প্রার্থীকে নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর প্রথম সিন্ডিকেটেই তিনি কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষক পদে নিয়োগ দেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার সম্ম জাকারিয়ার ছেলে সৈয়দ মোহাম্মেদ খালিদ মাহমুদকে। তিনি একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও এখানে নিয়োগ পেয়েছেন অনেক যোগ্য প্রার্থীকে ডিঙ্গিয়ে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উপাচার্যের দলীয়করণ নীতি এখনও বহাল আছে। সম্প্রতি প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগে অস্থিওলোজি ও মেডিক্যাল এন্টোমলোজিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রভাষক চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিএসসি ও এমএসসিতে অস্থিওলোজি বিষয়ক কোর্স আদৌ পড়ানো হয় না। শুধু মাস্টার্সে মেডিক্যাল এন্টোমলোজির হাফ ইউনিটের একটি কোর্স থাকলেও সেটা পড়ানোর জন্য ৪ জন শিক্ষক আছে। শুধু দল ভারী করার জন্য হাফ ইউনিটের একটি কোর্সের জন্য আরও দু'জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে।

উপাচার্য মুস্তাহিদের শাসনামলে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। অভিযোগ রয়েছে, এসব নিয়োগে দলীয়করণ, ব্যক্তিগত আনুগত্য এবং আর্থিক লেনদেনই প্রধান যোগ্যতা হিসেবে কাজ করেছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিতর্ক সৃষ্টি হয় নবনির্মিত বেগম খালেদা জিয়া হলে। এই হলে কোন প্রকার বিজ্ঞাপন ছাড়াই মাস্টার রোলে নিয়োগ পায় প্রায় ৩০ কর্মচারী। এছাড়া ২০০৬ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর তিন মাসে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের বিভিন্ন সভায় ৯৮ টি সম্পূর্ণ নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়।

ছাত্র ভর্তিতে দুর্নীতি

গত ৩ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন শতাধিক বিতর্কিত ভর্তির ঘটনা ঘটেছে। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে মেধার ভিত্তিতে মাত্র এক হাজার এক শ' ৬৮ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। অথচ ওই বছর অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে সরকার দলীয় মন্ত্রী, এমপি, নেতা, ছাত্রদল নেতা, শিক্ষক নেতা, কর্মচারী নেতা ও আমলাদের সুপারিশ রাখতে গিয়ে বিভিন্ন কোটায় ২৩০ শিক্ষার্থী ভর্তির ঘটনা ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে। এই সময় খেলোয়াড় ও সাংস্কৃতিক কোটায় ভর্তিকৃতদের পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকাণ্ডে পাওয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভর্তির অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তে খোদ জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের চাপের মুখে সে সময় বর্তমান ভিসি খেলোয়াড় ও সাংস্কৃতিক কোটা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন।২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে মুক্তিযোদ্ধা এবং পোষ্য কোটায় ভর্তি করা হয় ১৬৯ শিক্ষার্থীকে। এবছর শুধুমাত্র ফার্মেসি বিভাগেই ভর্তি করা হয় প্রায় ৩০জনকে। ভিসির কাছের লোক হিসেবে পরিচিত ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষক মাফরুহী সাত্তার এক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেন। এসব ভর্তিতে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভর্তি ফরমের টাকা

২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে চারটি অনুষদে ৫৩ হাজার ফরম বিক্রি থেকে মোট আয় হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৬০লাখ টাকা। এ আয়ের সিংহভাগই যাচ্ছে শিক্ষকদের পকেটে। ভর্তি পরীক্ষার মোট আয়ের কোন অর্থই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও খাতে ব্যয় হয় না। প্রশ্নপত্র মুদ্রণসহ পরীক্ষার আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদে পুরো টাকাটাই শিক্ষক, কর্মকর্তারা ভাগ করে নেয়।

অনুমোদন ছাড়াই নতুন বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমতি ছাড়াই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। বিভাগ দু'টি হলো লোকপ্রশাসন ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ।অনুমোদন ছাড়া বিভাগ খোলায় মঞ্জুরী কমিশন উক্ত বিভাগের জন্য টাকাও দিচ্ছে না। তথাপিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দু'টি বিভাগেই ছাত্র ভর্তি করে ক্লাস করাচ্ছে।

পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতে অনিয়ম

বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার এ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (পিজিডি) কোর্সের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুদান দেড় কোটি টাকা ব্যবহারে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।এছাড়া ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শ' লাইনবিশিষ্ট টেলিফোন এক্সচেঞ্জের উন্নয়ন কাজেও ১৫ লাখ টাকা লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবহন খাতে বছরে গচ্চা যাচ্ছে প্রায় দুই কোটি টাকা। খোদ উপাচার্য মুস্তাহিদুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যা অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি গাড়ি ব্যবহার করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়টির দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল বায়েস জনকণ্ঠকে বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত তিন বছরে প্রশাসনের বিভিন্ন খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগগুলো অবিলম্বে খতিয়ে দেখে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা দরকার। বিগত জোট সরকারের আমলে প্রশাসনের যে দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি শুরু হয়েছিল, আজও তা বহাল আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে এই অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করা জরুরী।